ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5
Volume- I, Issue-VI, July, 2025, Page No: 1426-1435
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711

আধুনিক ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম: তত্ত্ব ও প্রয়োগ

সোহেল রানা, *গবেষক, দর্শন ও জীবন-জগৎ বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.07.2025; Accepted: 30.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publications. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In this paper, an attempt has been made to understand the relevance of the *Varnáshramadharmas* in contemporary society. In the current societal context, we have observed the misinterpretation and misuse of the *Varnaśramadharmas*. However, we argue that, in the context of the present chaotic society, the correct understanding and application of the *Varnáshramadharmas* may become highly relevant. It may help us to become responsible and moral beings. On the one hand, it specifies the limitations of our actions and teaches us to control ourselves. On the other hand, when properly understood, the *Varnáshramadharmas* encourages self-realisation, self-purification, and self-improvement: However, we argued against the traditional *Varnadharmas* based on birth. Following the *Bhagavadgitā*, we contend that the *Varnadharmas* should be based solely on merit (***guṇa***) and deeds (***karma***). It not only helps to realise one's given duty but also maintains true societal balance.

Keywords: Svadharma, Varṇadharma, Āśramadharma, Guṇa, Karma, Self-improvement

ভারতীয় নীতিশাস্ত্র স্বীকৃত চতুর্বিধ পুরুষার্থ গুলির মধ্যে অন্যতম পুরুষার্থ হল ধর্ম। পুরুষার্থ বলতে সাধারণত তাকেই বোঝানো হয় যা মানুষ পেতে চায়। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যে যাকে religion বলা হয়, ভারতীয় 'ধর্ম' শব্দটি একই অর্থ বহন করে না। পাশ্চাত্য religion বলতে কিছু আচরণ ও বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রে 'ধর্ম' হল 'ধারণাৎ ধর্মম ইত্যাহু' অর্থাৎ মানুষ ও সমাজকে যা ধারণ করে থাকে বা শৃঙ্খলা রক্ষা করে তাই হল ধর্ম। ব্যুৎপত্তিগতভাবে ধর্ম শব্দটি 'ধৃ' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যুক্ত করে গড়ে উঠেছে। 'ধারণ করা' হলো 'ধৃ' ধাতুর অর্থ। ঋক বেদে 'ঋত'কে ধর্ম বলা হয়েছে। ঋত এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, যা সমগ্র জীব ও জগতকে পরিচালিত বা শৃঙ্খলিত করে থাকে। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে ঋতকে 'অদৃষ্ট' এবং মীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' বলা হয়ে থাকে। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনে ধর্ম বলতে অহিংসাকে বোঝানো হয়। আবার বেদ বিহিত কর্মকেও অনেকে ধর্ম বলে মনে করেন। আবার অনেকে আচার, সদাচার, কর্তব্যকে ধর্ম বলে মনে করেন।

হিন্দু নীতিবিদ্যাকে দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা হয়েছে- ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ। ব্যক্তি কেন্দ্রিক নীতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো চিত্তশুদ্ধি। এই নীতিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধির পরিপূর্ণতা উপলব্ধি হয় ব্যক্তির সর্বোচ্চ কল্যাণ উপলব্ধির মাধ্যমে। এই নীতিবিদ্যা ব্যক্তির শৃঙ্খলাপরায়ণতা নিয়ে আলোচনা করে।

হিন্দু নীতিবিদ্যার ভিত্তি হল কর্তব্য সম্পর্কে ব্যক্তি নিরপেক্ষ নৈতিকতা। এখানে 'কর্তব্য' শব্দের ব্যক্তি নিরপেক্ষ অর্থ হল 'ধর্ম'।[১] এখানে ব্যক্তি নিরপেক্ষ নৈতিকতা বলতে সাধারণ ধর্ম এবং আশ্রম ধর্মকে বোঝানো হয়, এই বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্রিয়াসমূহ ও বাহ্যিকবিধিকেও বোঝানো হয়।[২] ব্যক্তির নৈতিক অভিভাবকত্বাধীন স্তরকেও ব্যক্তি নিরপেক্ষ নৈতিকতা বোঝায়। সামাজিক কল্যাণ নিয়েও আলোচনা করে এই নৈতিকতা।

হিন্দু নীতিবিদ্যায় যে সামাজিক নীতিবিদ্যার কথা বলা হয় তা বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তির বিশেষ সামর্থ্য, সামাজিক মর্যাদা, মেজাজ এবং জীবনের অবস্থান অনুযায়ী কর্তব্য কর্মই বর্ণাশ্রম ধর্ম। এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে সাপেক্ষ কর্তব্য বিধি (code of relative duties) বলা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান (বর্ণধর্ম) ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের (আশ্রম ধর্ম) স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাই একে হিন্দু সাপেক্ষ নীতিবিদ্যা (relativistic ethics of the Hindus) বলা হয়। সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পালন করবে, অনুরূপভাবে একজন ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্যের সকল ধর্ম মেনে চলবে। তাই বলা যায় শর্তাধীন আদেশের কথা বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে। কিন্তু একথা বলা যায় না যে এইগুলি ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।[৩] কিন্তু চতুরাশ্রমের ক্ষেত্রে বিশেষ সামর্থ্যবান ব্যক্তি একটি আশ্রম পালন না করে পরবর্তী আশ্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিষয় থাকে।

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে দুই প্রকার ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সাধারণ ধর্ম ও বিশেষ ধর্ম বা স্বধর্ম। সাধারণ ধর্ম সামাজিক অবস্থান, জীবনযাপন প্রণালী নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের পালনীয়। এই ধর্ম যেমন সার্বিক তেমনি নিত্য। এই ধর্ম নিঃশর্ত ভাবে পালনীয়। এই নিঃশর্ত যে অনুজ্ঞা তা পাশ্চাত্য দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মনুসংহিতায় বিভিন্ন সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মনুসংহিতায় ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
> ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম লক্ষণম্।"[৪]

যেমন ধৃতি (ধৈর্য), ক্ষমা (অপরাধ মার্জনা), দম (সহনশীলতা), অস্তেয় (অন্য কারো দ্রব্য অপহরণ বা চুরি না করা), শৌচ (দৈহিক ও মানসিক পরিচ্ছন্নতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয় সংযম), ধী (মেধা), বিদ্যা (অনুশীলনের দ্বারা জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান), সত্য (যথার্থ), এবং আক্রোধ (রাগ বা ক্রোধ শূন্যতা) । এছাড়াও প্রশস্তপাদ ও অন্যান্য দার্শনিকগণ সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এক কথায় বলা যায় এই সাধারণ ধর্ম বর্ণ, আশ্রম ধর্ম নিরপেক্ষভাবে সকলের পালনীয় কর্তব্য।

পুরাতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদগণ বিভিন্ন তথ্য ও বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মনে করেন, ঋকবেদের যুগ থেকে বর্ণাশ্রম ধর্ম শুরু হয়। এই ঋকবেদের সময়কাল বলতে ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা পূর্বের সময়কে বোঝানো হয়েছে। ঋকবেদের পুরুষসূক্তে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাথমিক রূপরেখা পাওয়া যায়। এই পুরুষসূক্ততে বলা হয় ব্রহ্মা অর্থাৎ পুরুষের দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হয়েছে। ব্রহ্মা বা পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্যের উৎপত্তি এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছে। এই বিষয়টি মনুসংহিতাতেও বলা রয়েছে।[৫] ঋকবেদের পরবর্তীকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে এই বর্ণাশ্রম সুসংঘঠিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস রূপ আশ্রম ব্যবস্থাও সমাজে যুক্ত হয়। এই বৈদিক যুগের সময়কাল ১০০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বকে ধরা হয়। পরবর্তীকালে মনুস্মৃতি ও উপনিষদ যুগে এই বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে শাস্ত্র ও নিয়মানুসারে মনুস্মৃতিতে সংজ্ঞায়ন করা হয়। এই সময় থেকেই বর্ণাশ্রম ধর্ম মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজের শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। জন্মগ্রহণের সময় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিভিন্ন পার্থক্য বিভিন্ন মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এগুলি তাদের পূর্ব-পূর্ব কৃতকর্মের ফল। এটা থেকে আমরা বলতে পারি প্রত্যেক মানুষই নিজ ও অপরের মধ্যে এই অসাম্য বা পার্থক্যের কারণ। এর ভিত্তিতে বর্ণ প্রথার উৎপত্তি। এই ব্যক্তিগণ স্বধর্ম অর্থাৎ নিজ ধর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সমাজ নিজ অবস্থান অপেক্ষা উচ্চতর স্থান লাভ করবে। মানুষ মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে জীবনকে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে জীবনকে নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে।

স্বধর্ম বা বিশেষ ধর্ম:

স্বধর্ম বলতে বর্ণাশ্রম ধর্মকে বোঝায় অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম উভয়ের ধর্মকে বোঝানো হয়। বেদের উপর নির্ভর করে বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়েছে। এই বিশেষ বা স্বধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সাধারণ ধর্ম।[৬]

বর্ণধর্ম:

আক্ষরিক অর্থে 'বর্ণ' শব্দটি 'রং' অর্থে ব্যবহৃত হলেও দর্শনে মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা রূপে দেখা হয়, যে প্রবণতার ওপর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভরশীল। এই বর্ণভেদ প্রসঙ্গে দুটি মতবাদ লক্ষ্য করা যায়- ১। জন্মগত বর্ণধর্ম ২। গুণকর্মগত বর্ণধর্ম। ঋকবেদের পুরুষসূক্তে বলা হয়েছে এক পরম পুরুষের কল্পনা করে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়েছিল, বাহুদ্বয় থেকে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয়েছিল, উরুদেশ থেকে বৈশ্যের উদ্ভব হয়েছিল এবং পা থেকে শূদ্রের উৎপত্তি হয়েছিল। অন্যদিকে ভগবদ্গীতায় জীবকূলের গুণ ও কর্ম অনুসারে চতুর্বর্ণের উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।"[৭] এক্ষেত্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণকে বোঝানো হয়েছে। জগতের বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যেমন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ রয়েছে, অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ রয়েছে। মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে পার্থক্য বা বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মধ্যে এদের মধ্যে একটি গুণ প্রধান হিসেবে প্রতিপাদিত হয় এবং অপর দুটি গুণ হীনবল হিসেবে গণ্য হয়। এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বর্ণের উদ্ভব হয়েছে।

পুরুষসূক্ত সম্পর্কে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে নিন্দা পোষণ করেন। কেননা, তারা মনে করেন ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং শূদ্রগণ নিম্নজাত এরূপ যে সামাজিক বিভাজন তার উৎপত্তিস্থল হলো পুরুষসূক্ত। তাঁরা একথা আরো মনে করেন যে জাতপাত ভিত্তিক যে ভেদাভেদ তার উৎপত্তিও এখান থেকে। অবশ্য পি:ভি কানে তাঁর *হিস্ট্রি অফ ধর্মশাস্ত্র* গ্রন্থে এই জাতপাত ভিত্তিক ভেদাভেদ যে পুরুষসূক্তে রয়েছে তা অস্বীকার[৮] করে বলেছেন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপত্তি হয়েছে বলে সমাজে উঁচু স্থান এবং পদযুগল থেকে শূদ্রদের উৎপত্তি হয়েছে বলে তাদের স্থান অত্যন্ত নিম্নস্থান এমন বিধি পুরুষসূক্তে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না বলে মনে করেন। কিন্তু একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে এই পুরুষসূক্তটিকে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেউ জাতিভেদের কারণ হিসেবে গণ্য করেছেন। ঋকবেদের সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা অনুসরণে মনুসংহিতায় বলা হয়েছে

> "সেই মহাকান্তিবান (দেব) এই সকল সৃষ্টি রক্ষার জন্য মুখ, বাহু, উরু ও পদ থেকে জাত (বর্ণগুলির) কর্ম পৃথকভাবে সৃষ্টি করিলেন।"[৯]

বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণেরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে এবং মনে করেন, সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল ব্রাহ্মণ।[১০] প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের পৃথক পৃথক কর্ম প্রচলিত ছিল।

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে দুটি মতবাদ পাওয়া যায়। ১। গুণকর্ম জনিত বর্ণধর্ম ২। জন্মজনিত বর্ণধর্ম।

গুণকর্ম জনিত বর্ণধর্ম:

সাংখ্য ও যোগ দর্শনে প্রতিটি বস্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমবায়ে গঠিত হয়। অনুরূপভাবে মানুষও এই তিনটি গুণের সমবায়ে গঠিত হয়। কিন্তু, তিনটি গুণ সাম্যবস্থায় স্থির হিসেবে থাকে না। এই তিনটি গুণের মধ্যে দুটি গুণের তুলনায় একটি গুণ প্রধান হিসেবে গণ্য হয়। প্রতিটি গুণের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন সত্ত্বগুণের বৈশিষ্ট্য লঘু ও প্রকাশক। রজঃ গুণের বৈশিষ্ট্য চল ও উপষ্টম্ভক ও চঞ্চল এবং তমঃ গুণের বৈশিষ্ট্য গুরু ও আবরণকারী।[১১] সাংখ্য ও যোগ দর্শনের তত্ত্ব প্রাচীন বলে মহাভারত ও গীতায় এর অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তাই বলা যায়, কোন কোন মানুষ সত্ত্বপ্রধান, তেমনি কোন কোন মানুষ রজঃ প্রধান হয়। আবার কেউ কেউ তমঃ প্রধান হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন মানুষের মধ্যে যে গুণের আধিক্য সেই গুণ অনুসারে মানুষের বৈশিষ্ট্য হয়। এই গুণের বৈষম্যের ফলে বর্ণভেদের সৃষ্টি হয়েছে। এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের কর্মাদি নির্ধারণ করা হয়েছে।

ভগবদ্গীতায় বলা হয় গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে স্বধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণধর্মের কথা বলা হয়েছে। কেননা একজন ব্যক্তির যে ধরণের স্বভাব রয়েছে সেই স্বভাব নির্দিষ্ট আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে ব্যক্তির স্বভাবই হল বর্ণের নির্ধারক। এখানে স্বভাবের দ্বারাই গুণ নির্ধারিত হয়। মহাভারতে মনে করা হয় চার প্রকার যে কর্ম সেটাই প্রকৃতপক্ষে চতুর্বর্ণের সারসত্তা। কোন ব্যক্তি কিভাবে কর্মরূপ আচরণ করে তার ওপরই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র নির্ভর করে থাকে। গীতা অনুযায়ী, বংশ অনুযায়ী জন্মগ্রহণের ওপর বর্ণধর্ম নির্ভর করে না। যুধিষ্ঠির মহাভারতের বনপর্বে বলেন ব্রাহ্মণ হলেন তিনি যার সত্য, দান, ক্ষমা, সচ্চরিত্র, কোমলতা, তপস্যা ও দান—এই গুণগুলো থাকে। কোন ব্রাহ্মণের মধ্যে

যদি এই গুণগুলো না থাকে তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হতে পারে না। আবার কোন শূদ্রের মধ্যে যদি এমন গুণ থাকে তাহলে সে শূদ্র হিসাবে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং বলা যায় নির্দিষ্ট বংশে জন্মগ্রহণ ব্রাহ্মণত্ব বা শূদ্রত্বের নির্ণয়ের মাপকাঠি নয়।[১২] ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের জন্মবৃত্তান্ত নিকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সত্যবাদিতারূপ স্বভাবের কারণে গুরু তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।[১৩]

জন্মজনিত বর্ণধর্ম:

মনুসংহিতায় দশম অধ্যায়ে চারটি বর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে কোন বর্ণের কোন বিশেষ ধরণের কর্ম করা উচিত সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কোন মানুষের জন্ম কোথায় হয়েছে তার ওপর নির্ভর করে বর্ণধর্ম নির্ণয় হয় এবং সেই বর্ণধর্ম অনুযায়ী তার কোন স্বধর্ম অনুসরণ করা উচিত তা নির্ধারিত হয়।[১৪] এক্ষেত্রে ব্যক্তির গুণ বা প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে কর্মসম্পাদনের কোনো সুযোগ থাকে না। অর্থাৎ মনুসংহিতা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যেরূপ পরিবার বা বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই বংশ বা পরিবার যেরূপ কর্ম সম্পাদন করত সেইরূপ কর্ম সম্পাদন করবে। অর্থাৎ প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা যে রূপ কর্ম সম্পাদন করেছেন সেই কর্ম তার পরবর্তী প্রজন্ম সম্পাদন করবে। সেই জন্য এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির পিতা রাজা তথা রাজ্য শাসন করলে তিনিও তার বাবার কর্ম অর্থাৎ রাজ্য পরিচালনা ও শাসনকার্যে যুক্ত হবেন। যিনি পুরোহিত তার পুত্র পৌরোহিত্য করবেন। অনুরূপভাবে বৈশ্য বর্ণের কোন পুত্র তার বাবার অনুরূপ পশুপালন ও কৃষিকাজে যুক্ত হবেন। শূদ্রবর্ণের কোন পুত্র তার বর্ণ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য শ্রেণীর সেবাকর্মে যুক্ত হবেন।

এখন গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণে বিভক্ত করা হয়েছে, তাদের ধর্ম অর্থাৎ বর্ণধর্ম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ব্রাহ্মণ ব্যক্তির মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য রয়েছে বলে কথিত তাই তাঁরা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম চিন্তা করতে সামর্থ্যবান। ভগবদ্গীতায় বলা হয়

> "শম (অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযম), দম (বাহ্যইন্দ্রিয় সংযম), তপঃ (তপস্যা), শৌচ (বাহ্যভন্তর শুচিতা), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান (শাস্ত্রজ্ঞান), বিজ্ঞান (তত্ত্বানুভূতি), এবং আস্তিক্য বুদ্ধি (শাস্ত্রে স্থির বিশ্বাস) ব্রাহ্মণের স্বভাবগত কর্ম।"[১৫]

বুদ্ধিমত্তার কারণেই ব্রাহ্মণ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হয়। ব্রাহ্মণেরা যোগ্যতা অনুসারে, অধ্যায়ন, দান, প্রতিগ্রহ, যজন, যাজন, অধ্যাপনা- এই ছয়টি কর্মে যুক্ত থাকবেন।[১৬] ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্যক্তি, যাজন ও অধ্যাপক ব্যক্তির কাছ থেকে দান গ্রহণ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। ব্রাহ্মণ তাঁর নির্ধারিত ধর্ম বা কর্ম থেকে বিচ্যুত হলে ব্রাহ্মণ হিসাবে গণ্য হতে পারে না। সুতরাং বলা যায় ব্রাহ্মণ গন সমাজকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিশা দেখানোর উদ্দেশ্য উপলব্ধ জ্ঞান প্রচার, যজ্ঞ-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় শিক্ষা, আচার-আচরণ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা। এইজন্য ব্রাহ্মণের জ্ঞান ও আত্মসংযম থাকা আবশ্যক।

ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রজঃগুণের প্রাধান্য থাকে বলে কথিত। ভগবদ্গীতায় বলা হয় "শৌর্য, তেজ, ধৃতি (ধৈর্য্য), দাক্ষ্য (দক্ষতা), যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ও প্রভুত্বভাব— এই গুলি স্বাভাবিক ক্ষত্রিয় কর্ম।"[১৭] ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য শাসন ও পরিচালনা, সমাজ রক্ষা, রাজনীতি, যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্বদান, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করার মাধ্যমে সমাজে ন্যায় ও শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। এমন আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে ক্ষত্রিয়ের যদি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয় তাহলে সে একজন বীর হিসাবে পরিগণিত হবেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বিরাজ করবে এবং অস্ত্র যেকোনো স্থানে প্রয়োগ করতে পারবেন না। ক্ষত্রিয়গণ যদি হিংসাত্মক ভাবে অস্ত্র প্রয়োগ করলে তা অত্যন্ত নিন্দা জনক হিসেবে গণ্য হবেন। তবে রাজ্য অন্তর্গত কোন আগ্রাসী শক্তি জনগণকে ভুল পথে চালিত করলে তাকে দমন করাও গোত্রের কাজ। অধ্যায়ণ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ক্ষত্রিয়ের অধিকার স্বীকার করা যায়।

বৈশ্যগণ বেশি পরিমাণ রজঃগুণ বিশিষ্ট, অল্প পরিমাণ তমঃগুণ বিশিষ্ট বলে কথিত। ভগবদ্গীতায় বলা হয় "কৃষিকাজ, গো-পালন, বাণিজ্য এইগুলি স্বাভাবিক বৈশ্য কর্ম।"[১৮] বৈশ্যদের প্রধাণ ধর্ম হচ্ছে সকল প্রাণীর খাদ্যের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করে সমাজের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ঠিক রাখা। বৈশ্যগণ অর্থ বিষয়ে যেমন দাম্ভিক হতে পারবেন না তেমনি মোহময় চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হতে পারবেন না। উৎপাদন, বাণিজ্যিক জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, সঞ্চয় ইত্যাদি গুণ

বৈশ্য দের মধ্যে রয়েছে। তাঁরা যজ্ঞ চলাকালীন ব্রাহ্মণদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য অর্থ সাহায্য করবেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যজ্ঞে অংশ নিতে পারলেও যজ্ঞ পরিচালনায় অধিকার নেই।

শূদ্রগণ অল্প পরিমাণ রজঃগুণ বিশিষ্ট, বেশি পরিমাণ তমঃগুণ বিশিষ্ট বলে কথিত। ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে "সেবামূলক কর্মই শূদ্রদের স্বভাবজাতকর্ম।"[১৯] ফলে সমাজে এক সহনীয় পরিবেশ বজায় থাকে। শূদ্রদের মধ্যে আনুগত্য, সহিষ্ণুতা, পরিশ্রম ইত্যাদি গুণ রয়েছে।

শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের সেবা প্রদান করবেন। শূদ্রগনের উপনয় সংস্কার ও যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কোন অধিকার ছিল না।

উক্ত চারটি বর্ণধর্ম নিজ নিজ কর্ম গুলি সম্পাদন করে থাকতো। ফলে সমাজে একটি সামঞ্জস্যের পরিবেশ বজায় থাকত।

আশ্রম ধর্ম:

স্বধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো আশ্রম ধর্ম। মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এই সমস্ত পর্যায়কে জীবনচক্র বলে। আসলে জীবনচক্র বলতে মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের বৃদ্ধি ও বিকাশের সামগ্রিক বিষয়কে বোঝায়। মানুষের ক্ষেত্রে দেখলে দেখব শৈশব, কৈশোর, প্রাপ্তবয়স্ক ও বার্ধক্যের মত পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়টিকে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে দেখা যাবে একজন মানুষের জীবন অধ্যায়কে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল— ব্রহ্মচর্য (ছাত্র), গার্হস্থ্য (গৃহস্থ), বানপ্রস্থ (নির্জনবাসী) ও সন্ন্যাস (সন্ন্যাসী)।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে মানুষের জৈব সত্তা ও পারমার্থিক সত্তা উভয়কেই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, কোন সত্তাকে অস্বীকার করা হয়নি। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজে মোক্ষলাভকে মানুষের চরম লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মানুষ মোক্ষলাভের জন্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবে একথা যেমন আশ্রমধর্মে ফুটে উঠেছে, তেমনি মানুষের যে জৈব সত্তা রয়েছে তাও আশ্রম ধর্মে উপেক্ষাত করা হয়নি বরং উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। তাই বলা যেতেই পারে, আশ্রম ধর্মের মাধ্যমেই মানুষ জৈব সত্তা থেকে পারমার্থিক সত্তায় উত্তরণ হয়ে থাকে।

'শ্রম' ধাতু থেকে 'আশ্রম' শব্দের উদ্ভব হয়েছে, যার অর্থ 'পরিশ্রম করা'। কঠোর আত্মসংযম রূপ ধারণাকে আশ্রম ধর্মের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি আশ্রমভেদে কর্তব্যের ভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রতিটি আশ্রমের কর্তব্য পালনের দ্বারা পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশ করে। আশ্রমধর্ম পালন সম্পূর্ণ হওয়ার পর মোক্ষলাভ করে থাকেন। একজন ব্যক্তি চার আশ্রমে বেদের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুশীলন করে থাকেন। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে ব্যক্তি 'মন্ত্র', গার্হস্থ্য আশ্রমে 'ব্রাহ্মণ', বানপ্রস্থ আশ্রমে 'আরণ্যক' এবং সন্ন্যাস আশ্রমে 'উপনিষদ' রূপ বেদের অনুশীলন করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আশ্রম ধর্মে ব্যক্তির বয়স অনুযায়ী কোন আশ্রমে কি বা কি জাতীয় পরিশ্রম কর্তব্য হিসেবে গণ্য হয় তার একটি রূপরেখা।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠে যে চতুরাশ্রম ধর্ম সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না বর্ণ সাপেক্ষে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ পাওয়া যায় যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের কথোপকথনে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম বলেন ব্রাহ্মণের নিমিত্তে ব্রহ্মচর্যাদির আশ্রম বিহিত হয়েছে। চারটি আশ্রমে যে ব্রাহ্মণ প্রাণায়ামাদি ষট কার্যে নিরত, ধর্মপরায়ণ, বিশুদ্ধতা, তপোনুষ্ঠান নিরত ও অতি বদাণ্য হন তিনি অক্ষয় লোক লাভে সমর্থ্য হয়ে থাকেন। ভীষ্ম বলেন সর্বপ্রথম ভগবান ব্রহ্মা ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব সমুদায় আশ্রমে উহাদের অধিকার আছে। এছাড়া ব্রাহ্মণদের যেসব কর্তব্য কর্মের কথা বলা হয়েছে তার সঙ্গে ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।[২০] চারটি আশ্রমধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম:

আশ্রম ধর্মের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ব্রহ্মচর্য আশ্রম। এই আশ্রম জীবন প্রস্তুতির ভিত্তি স্বরূপ। আসলে প্রাক বিবাহের সংযত জীবন যাপন হলো ব্রহ্মচর্য। আশ্রমে বসবাসকারী ব্রহ্মচারীদের উপনয়নাদি সংস্কার করতে হবে, নিয়ম অনুসরণ করতে হবে, সুখ-দুঃখ সহ্য করতে হবে, শুচি পরায়ণতা অর্জন করতে হবে, বিনয় ভাব প্রকাশ

করতে হবে, আলস্য পরিত্যাগ করতে হবে। এই আশ্রমে মানুষ জীবন ও জগত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান বা বিদ্যা লাভ করতে হবে। ব্রহ্মচারীকে বেদ শিক্ষার মাধ্যমে চরিত্র কেমন হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে নিজের চরিত্র সেই মতো গঠনের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। সে চরিত্র গঠন করতে গিয়ে ইন্দ্রিয় সংযম, আত্ম সংযম ও কর্মতৎপরতার দিকে মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি জীবনে সমস্ত কর্ম সাধনের মধ্যেই ব্রহ্মভাবনায় লীন হয়ে থাকে, তিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ব্রহ্মচারীর আরো কিছু কর্তব্য রয়েছে যেমন হোমাগ্নি, ভিক্ষা সংগ্রহ, গুরুর খাদ্য প্রস্তুত, গুরুকে সেবা প্রদান ইত্যাদি।

গার্হস্থ্য আশ্রম:

ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরিসমাপ্তির পর মানুষ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করে। এই আশ্রমেই সংযত বিবাহ জীবন উপভোগ করে। এই আশ্রমে চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে তিনটি অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কাম এর সাক্ষাৎ লাভ হয়। এই আশ্রমেই যজ্ঞ সম্পাদন ও ঋণ মোচনের সুযোগ থাকে। এছাড়া বিভিন্ন ব্রত, ধর্মাচারণ যারা করে এবং ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীগণ গৃহস্থ আশ্রম থেকে ভিক্ষা, হোম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এবং এদের সেবা প্রদানের সুযোগ এই আশ্রমেই সবচেয়ে বেশি হয়। এই আশ্রমে মানুষ ব্যবহারিক সমস্থ দায়-দায়িত্ব বহন করেন, সন্তান পালন করেন, অতিথি সেবা, মা-বাবাকে দেখাশোনা প্রভৃতি করেন। গার্হস্থ্য আশ্রমে তিন প্রকার ঋণ মোচনের সুযোগ থাকে—পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ।[২১] মানুষ সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে পিতৃঋণ মোচন করেন। এর মাধ্যমে সে বংশধারাকে অক্ষুন্ন রাখে। ঋষিঋণ মোচনের জন্য বেদ অধ্যায়ন, অধ্যাপনা করেন। যাগ যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করার মাধ্যমে দেবঋণ পরিশোধ করেন। পাঁচ প্রকার যজ্ঞ করার কথা এই গার্হস্থ্য আশ্রমে বলা হয়েছ- পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞ হলো পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। দেবযজ্ঞ হল হোম অনুষ্ঠান যেটা দেবতার উদ্দেশ্যে করা হয়। ঋষিযজ্ঞ বেদ পাঠের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে অতিথি সেবা মনুষ্যযজ্ঞ। সকল ইতর প্রাণীকে (দৃশ্য-অদৃশ্য) খাদ্যদান হলো ভূতযজ্ঞ। মানুষ এইভাবে বিভিন্ন ঋণ পরিশোধ করে থাকেন। প্রাণহত্যা জনিত পাপ কম করার জন্য পঞ্চযজ্ঞ করার বিধি রয়েছে।[২২] এছাড়া অন্যের প্রতি ঘৃণা, হিংসা, অহংকার ইত্যাদি থেকে গৃহস্থকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকতে হবে।

বানপ্রস্থ:

গার্হস্থ্য আশ্রম সমাপ্তির পরে মানুষ বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করে। এই আশ্রমের মূল লক্ষ্য চিত্তশুদ্ধি, মন শান্ত করা। চিত্তশুদ্ধি অর্জন করলে সে পরবর্তী কাঙ্ক্ষিত সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেখানেই তিনি মোক্ষ লাভ করেন। বানপ্রস্থ আশ্রমে মানুষ নির্জন অরণ্যে স্বেচ্ছা নির্বাসনে জীবন অতিবাহিত করেন। এই আশ্রমে মানুষ কৃচ্ছসাধনে নিমগ্ন থাকেন। ফলে মানুষ জগত ও জীবন সম্পর্কে আসক্তি মুক্ত হন। চিত্ত পরিশুদ্ধি হয়। ফলে নিজের সবকিছু ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। এই আশ্রমের ব্যক্তি বেদ অধ্যায়ন করেন, ধৈর্য্যের সঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করে থাকেন, বনের ফলমূল, পত্র-ওষধি ভোজন করে জীবন-যাপন করেন এবং বল্কলাদি প্রভৃতি পরিধান করে থাকেন। তাঁরা যে কোন স্থানে শয়ন করতে পারেন, তা বালুকাময় বা অমসৃণ যাই হোক না কেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যেমন শীত, বর্ষা ও দুর্যোগে সমানভাবে স্বাচ্ছন্দ। তাঁরা এই আশ্রমে পরিমিত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত থাকেন।

সন্ন্যাস:

বানপ্রস্থ আশ্রমের পরিণতি লক্ষ্য করা যায় সন্ন্যাস আশ্রমে। এই আশ্রমে প্রবেশ করতে হলে জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রতি সমস্ত রকম আসক্তি থেকে মুক্ত হতে হবে। তাঁদের মতে সোনা ও মাটির মধ্যে যেমন কোনো পার্থক্য নেই তেমনি শত্রু, মিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই সন্ন্যাস আশ্রমের রীতি হল বিচরণ করা। সন্ন্যাসীগণের কোন নিজস্ব ঘর নেই, তাই তাকে অনিকেত বলা হয়ে থাকে। তাঁরা বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, দেবালয় প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে থাকেন। তাই তাদের প্রবজ্যা বলা হয়ে থাকে। সন্ন্যাসী হলেন তিনি যিনি সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ের আসক্তির বিষয় থেকে মুক্ত থাকেন এবং নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে লব্ধ আত্মজ্ঞানের চর্চা করে থাকেন। সন্ন্যাসীগণ আত্মজ্ঞান উপলব্ধিতে এবং বেদ-উপনিষদ অধ্যায়নে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। তাঁরা সমস্ত রকম বাচিক, কায়িক ও মানসিক হিংসা থেকে মুক্ত হয়ে বিচরণ করেন। সমস্ত প্রাণী তাঁদের থেকে ভয় মুক্ত থাকেন। তাঁরা সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করে 'যম' ও 'নিয়ম' মেনে চলেন। যম হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য (ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, বীর্য

ধারণ করা), ও অপরিগ্রহ (সম্পদের প্রয়োজনীয় সীমানা নির্ধারণ করা ও ভোগ বিলাস বর্জন করা)। নিয়ম হলো শৌচ (শারীরিক ও মানসিক শুচিতা), সন্তোষ (সন্তুষ্ট থাকা), তপ: (তপস্যা) স্বাধ্যায় (অধ্যায়ন ও জপ্), ঈশ্বর প্রণিধান (ঈশ্বরের নিরয়তন চিন্তা ও ধ্যান, ঈশ্বরের প্রতি সর্বকর্ম সমর্পণ)। গৃহস্থের দান করা খাদ্যের মাধ্যমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকেন, তারা কোন ভিক্ষা চান না। ধর্ম, অর্থ, কাম তিনটি পুরুষার্থ এবং পরচর্চা ও পরনিন্দা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকেন। একজন সন্ন্যাসী সব সময় মানসিক প্রশান্তির অধিকারী থাকেন।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম বা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং সেই অনুযায়ী সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিচালিত হতো। কিন্তু এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে বিশ্লেষণ করলে যে সব বৈশিষ্ট্য গুলি ফুটে ওঠে তা বর্তমান সমস্যা জর্জরিত ব্যস্ত জীবনে এর উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত, বর্ণ ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং আশ্রম ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে কি কাজ করা আবশ্যিক তা এই বর্ণাশ্রম ধর্ম নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করেছে। সেটা অনুযায়ী জীবনযাপনই নৈতিক জীবন। ফলে বর্ণাশ্রম ধর্মের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি মানুষের যেমন দায়িত্ব, সত্য, নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়, তেমনি জীবনের প্রতিটি স্তরে নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দেয়। বর্তমান সময়ে এই ধরনের ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আবশ্যিক। কেননা, বর্তমান যুবসমাজ তথা জনগণের মাঝে এই দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ এইসব নৈতিক গুণের অভাবের ফলে সমাজের অবনমন লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়ত, আশ্রম ধর্ম মানুষকে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে সাহায্য করে। মানুষের জীবনকে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করে সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে সর্বোচ্চ প্রয়োজনীয় আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়ন করতে সাহায্য ও গুরুত্বকে উপলব্ধি করতে শেখায়। এখানেও একটি দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে। যেমন— মানুষ প্রথম শ্রেণীতে যে পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পড়াশোনা করে, পরবর্তীতে প্রতিটি শ্রেণীতে পাঠ্যসূচি পরিবর্তন হয়; এইভাবে চলতে চলতে দশম শ্রেণীতে জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা হয় এবং এই পরীক্ষার মাধ্যমে জীবন কোন পথে পরিচালিত হবে তা নির্ধারিত হয়, আত্মোন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। অনুরূপভাবে, আশ্রম ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ— এই তিনটি জীবনের পর্যায় ভালোভাবে সম্পন্ন করার পর সন্ন্যাসের উপযুক্ত হয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি, আত্মোন্নয়ন ও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং নিজের প্রচেষ্টায় সেগুলি অর্জন করে। অর্থাৎ, ধাপে ধাপে মানুষ জীবনকে গঠন করে। বর্তমানে এই বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বর্তমান সমাজের মানুষ বস্তুবাদী চিন্তাধারার দ্বারা পরিচালিত। ফলে মানুষ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোন থেকে আত্মোন্নয়ন করলেও আত্মশুদ্ধি, আধ্যাত্মিক উন্নতি—এইসব বিষয়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ নৈতিকতার উন্নতির জন্য অবশ্যই আধ্যাত্মিক উন্নতি, আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।

তৃতীয়ত, বর্ণাশ্রম ধর্মে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বর্ণভেদ করা হয় (ভগবদ্‌গীতার ব্যাখা অনুযায়ী)- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ফলে প্রত্যেকের যে নির্দিষ্টকর্ম সেই সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ ও দক্ষতা গঠনে মনোনিবেশ করতেন। ফলে সেই পেশা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করেন। এই দক্ষতা সমাজের উন্নতিতে সাহায্য করে। বিভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন বিভিন্ন পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে সমাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান। এইভাবে তৈরি হয় আধুনিক পেশাভিত্তিক চর্চা, যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তিগণ অত্যন্ত দক্ষ হন।

চতুর্থত, বর্ণ ও আশ্রম উভয় ধর্মের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার নিরিখে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ থাকে। বর্ণধর্মের ক্ষেত্রে দেখলে দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি বর্ণের ক্ষেত্রে তাদের স্বধর্মগুলি পরিবারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা হয় এবং সেই অভিজ্ঞতা তাদের আরো সমৃদ্ধ করে, যা সমাজ উন্নয়নে সাহায্য করে। আসলে পরিবার থেকে এক্ষেত্রে সেই স্বধর্ম গুলির নিয়মকানুন, দক্ষতা অর্জনের বিভিন্ন অসাধারণ টিপসগুলো শেখে। আশ্রম ধর্মের ক্ষেত্রেও বয়সের এবং অভিজ্ঞতার নিরিখে এক আশ্রম থেকে অন্য আশ্রমে উপনীত হন এবং সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে জীবনের লক্ষ্য মুক্তি লাভে সাহায্য করে। বর্তমানে সমাজে এই ধরণের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। যেমন কোন পরিবারের কেউ চিকিৎসক হলে সেই পরিবারের ছোটরা চিকিৎসক হতে উৎসাহ পায় বা সহজেই চিকিৎসক হতে পারেন। কেননা সেই চিকিৎসক হওয়ার জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, ছোট ছোট কোন পদক্ষেপ নিলে সহজেই তা সম্ভব সেই বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা ছোটদের যেমন উদ্বুদ্ধ করে তেমনি সেই পথে অগ্রসর হতে

সাহায্য করে। ফলে সে সেই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠে। অন্যান্য বৃত্তির ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি সমানভাবে প্রযোজ্য।

পঞ্চমত, প্রতিটি বর্ণের একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে এবং সেটি হল তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর্ম সাধন করা। অনুরূপভাবে আশ্রম ধর্মের প্রতিটি আশ্রমের একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে। ফলে প্রতিটি মানুষের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে। ফলে মানুষের একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করার মানসিকতা তৈরি হয়। বর্তমানে মানুষ উদ্দেশ্যহীন ভাবে জীবন যাপন করছেন। তাই মানুষ যাতে উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে সেই শিক্ষা বর্ণাশ্রম ধর্ম থেকে নেওয়া উচিত।

ষষ্ঠত, বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায় বিচারের বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। কেননা, বর্ণধর্ম ভগবদ্গীতার ভাষ্য অনুযায়ী গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ যোগ্যতা অনুযায়ী তার বর্ণ নির্ধারিত হয়। ফলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সাম্য ও ন্যায় বিচার করা হয়। আশ্রম ধর্মের ক্ষেত্রেও দেখা যায় একটি আশ্রমে কর্ম গুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হলে সে পরবর্তী আশ্রমে উপযুক্ত হয়। এইভাবে সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রমের মাধ্যমে মুক্তি লাভের সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে সাম্য ও ন্যায় বিচার লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান সমাজে এই চিন্তাধারা থেকে যে ন্যায় বিচার ও সাম্যের ধারণা গড়ে ওঠে তা সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন।

সপ্তমত, বর্ণাশ্রম ধর্মকে প্রত্যেক মানুষ সঠিকভাবে জীবনে বাস্তবায়ন করলে বর্তমান সমাজে যেসব সমস্যা যেমন পারিবারিক ভাঙ্গন, মানসিক অস্থিরতা, আত্মহত্যা ইত্যাদি বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এক অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। ফলে সেই সমস্যা অনেকাংশে কমে যেতে পারে। কেননা আশ্রম ধর্মে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারটি পর্যায়ে যেসব নিয়ম পরিবার, মানসিক শান্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে, সেই সব বিষয় সঠিকভাবে মেনে চললে এইসব সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে।

অষ্টমত, চতুর্বর্ণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ হলো ক্ষত্রিয়। এই ক্ষত্রিয় বর্ণ সমাজে ন্যায় বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকে। এদের মধ্যে বিভিন্ন গুণের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন আত্মত্যাগ, কর্তব্য পরায়ণতা, সাহস, শক্তি, দেশপ্রেম। এরা যেমন বাইরের শত্রু থেকে দেশকে রক্ষা করেন, তেমনি সমাজের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা দমন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনা, শাসন, রাজনীতি ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই বলা যায় ক্ষত্রিয় বর্ণের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল, তাদের আদর্শ থেকে বর্তমানে রাজ্য বা দেশের নেতৃত্বের গুণাবলী চর্চা করা যায়।

নবমত, বর্ণাশ্রম ধর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাদের নিজের ধর্ম পালন করলে এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস তাদের নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করলে ছোটরা প্রত্যেকে জানতে পারবে তার ধর্ম কি এবং কোন বয়সে কি করা উচিত। এছাড়া প্রত্যেকে নিজের কর্ম ও সীমা মেনে চললে মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ কমে গিয়ে সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে। ফলে সমাজ হবে উন্নত।

দশমত, বর্ণাশ্রম ধর্ম মানুষের মধ্যে দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একজন ব্যক্তির প্রতি, সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি, সকলের প্রতি কি দায়িত্ব পালন করা উচিত সে সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দেয়। এর মাধ্যমে ধর্মীয়, নৈতিক ও আত্মিক চর্চা সম্পন্ন হওয়ায় মানসিক শান্তি বিরাজ করে। এই দায়িত্ববোধ মানসিকতা বর্তমান সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

একাদশতম, আশ্রম ধর্মের যে চারটি স্তর রয়েছে, তার প্রথম স্তর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার ফলে জগত ও জীবন সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। নৈতিকতা গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা পরবর্তী সময়ে সুষ্ঠুভাবে জীবন পরিচালনার জন্য খুব ফলপ্রসু হয় এবং একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ফলে গার্হস্থ্য আশ্রমের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলি সঠিকভাবে পালন করতে পারে। এর ফলে পারিবারিক জীবনে অমূলক সমস্যা থেকে মুক্ত থাকা যায়। এছাড়া বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস স্তরে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। এই আশ্রম ধর্মের ফলে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নানা কর্ম করার মানসিকতা প্রস্তুত হয় এবং জীবন পরিচালনা করার জ্ঞান ও অভ্যাস গড়ে ওঠে।

সুতরাং সবশেষে এ কথা বলতে পারি যে বর্ণাশ্রম ধর্ম বর্তমান বিশৃঙ্খলাময় পরিবেশে খুবই প্রাসঙ্গিক। যদি বর্ণ ব্যবস্থাকে দায়িত্বভিত্তিক সমাজের বিন্যাস হিসেবে গ্রহণ করা যায় তাহলে তা খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে উঠবে। জ্ঞানচর্চাকার্য হিসাবে ব্রাহ্মণদের, প্রশাসনিক কর্তা হিসেবে ক্ষত্রিয়দের, অর্থনৈতিক কর্তা হিসেবে বৈশ্যদের এবং শ্রমজীবী ব্যক্তিদের শূদ্র হিসেবে গণ্য করা হতো। এই ব্যবস্থার আধুনিক রূপ যথাক্রমে গবেষক, বিজ্ঞানী, নৈতিক কর্তা (ব্রাহ্মণ); পুলিশ, প্রশাসনিক কর্তা, সেনাবাহিনী (ক্ষত্রিয়); শ্রমিক, উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, কৃষি উদ্যোক্তা (বৈশ্য); সার্ভিস ওয়ার্কার, প্রযুক্তিবিদ (শূদ্র) এই পেশাগুলি বর্তমান সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা করতে হবে ব্যক্তির গুণ ও কর্মদক্ষতা অনুসরণ করে। ভগবদ্গীতাতেও একই কথা বলা রয়েছে। কিন্তু কখনোই জন্মভিত্তিক করা উচিত নয়। এছাড়া যদি সকলেই একই ধরণের পেশা গ্রহণ করত তাহলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। তাই গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করা হলে সমাজে ভারসাম্য বজায় থাকে। প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর দর্শনেও এই ধরণের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় সামাজিক নীতিবিদ্যাকেই শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্লেটো তাঁর *রিপাবলিক* গ্রন্থে যে তিন শ্রেণীর কথা বলেছেন অভিভাবক শ্রেণী (যারা জ্ঞানবান বা প্রাজ্ঞ, কল্যাণ বা মঙ্গলের ধারণার প্রকৃতি অনুসারে আইন প্রণয়ন করেন), যোদ্ধা শ্রেণি (যাদের স্পষ্টবাদিতা, বীরত্ব, তেজ রয়েছে। এরা সমাজে আইনগুলোকে প্রয়োগ করেন, বহি:শত্রু ও রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলাকারীকে দমন করেন), এবং কারিগর শ্রেণী (উৎপাদক শ্রেণী, অর্থনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, এদের বৈশিষ্ট্য আত্ম সংযম ও মিতাচার)। এরা প্রত্যেকে স্বধর্ম বা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করলে 'ভারচু অফ জাস্টিস' (ন্যায়পরতা রূপ পুণ্যের সৃষ্টি হবে)। এক্ষেত্রে কেউ কারো কর্মে বাধা সৃষ্টি করবে না। তবে প্লেটোর দর্শনে সাধারণ ধর্মের উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিন্দু নীতিবিদ্যায় এই সাধারণ ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং তাকে বর্ণাশ্রম ধর্মের পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সাধারণ ধর্মকে জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই পালন করতে হয়। যেমন- ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করেন কারণ এটা তার স্বধর্ম। আবার তিনি অস্তেয় (চুরি না করা) পালন করবেন। এই অস্তেয় জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে পালন করবেন। আসলে মানুষের সঙ্গে মানুষের একটি সম্পর্ক রয়েছে যা বিশেষ শ্রেণির সাপেক্ষে অস্বীকার করা যায় না। তাই উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে এই সাধারণ ধর্ম পালন। হিন্দু নীতিবিদ্যায় শূদ্রদের মর্যাদা কম হলেও নৈতিক সুরক্ষা ছিল। কিন্তু প্লেটোর দর্শনে ক্রীতদাস, বর্বর প্রভৃতিদের যেমন কোন নৈতিক মর্যাদা ছিল না, তেমনি তাদেরকে নাগরিক মর্যাদাও প্রদান করা হতো না। আবার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করার মাধ্যমে নিজের বর্ণের উপকারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধন হয়। হিন্দু নীতিবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব এখানেই।

তথ্যসূত্র:

১. মৈত্র, সুশীল কুমার। *দি এথিক্স অফ হিন্দুস্*। ক্যালকাটা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৫, পৃ: ৭।
২. তদেব, পৃ: ৪।
৩. তদেব, পৃ: ১-২।
৪. *মনুসংহিতা* ৬/৯২ *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), কলকাতা, সদেশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ২২১।
৫. *মনুসংহিতা* ১/৩১ তদেব পৃ: ৫।
৬. মৈত্র, সুশীল কুমার। *দি এথিক্স অফ হিন্দুস্*। ক্যালকাটা, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৫, পৃ: ৩।
৭. *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা* ৪/১৩ *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা,* স্বামী ভাবঘনানন্দ (অনুবাদ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, প: ১০৪।
৮. সান্যাল, ইন্দ্রাণী। এবং গোস্বামী, গার্গী। *ভারতীয় ধর্মনীতি: তথ্য ও তত্ত্ব*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০২৪, পৃ: ৪৪।
৯. *মনুসংহিতা* ১/৮৭ *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), কলকাতা, সদেশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৪।
১০. *মনুসংহিতা* ১০/৩ তদেব, পৃ: ৪৫৬।

১১. মিশ্র, শ্রীমদ্ বাচস্পতি। *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃতা সাংখ্যকারিকা সহিত, শ্রী নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (ব্যাখ্যা), কলিকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৩৫।
১২. সান্যাল, ইন্দ্রাণী। এবং গোস্বামী, গার্গী। *ভারতীয় ধর্মনীতি: তথ্য ও তত্ত্ব*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০২৪, পৃ: ৪৯।
১৩. *ছন্দোগ্য উপনিষদ* ৪/৪/৫
১৪. *মনুসংহিতা* ১০/৫ *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), কলকাতা, সদেশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৫৭।
১৫. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ১৮/৪২ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* স্বামী ভাবঘনানন্দ (অনুবাদ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, পৃ: ৪১৩।
১৬. *মনুসংহিতা* ১০/৭৫ *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), কলকাতা, সদেশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৪৭৩।
১৭. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ১৮/৪৩ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* স্বামী ভাবঘনানন্দ (অনুবাদ), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৩, পৃ: ৪১৪।
১৮. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ১৮/৪৪ তদেব, পৃ: ৪১৪।
১৯. *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ১৮/৪৪ তদেব, পৃ: ৪১৪।
২০. সান্যাল, ইন্দ্রাণী। এবং গোস্বামী, গার্গী। *ভারতীয় ধর্মনীতি: তথ্য ও তত্ত্ব,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০২৪, পৃ: ৫৪।
২১. মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন*। বাৎস্যায়ন ভাষ্যসহ, (চতুর্থখন্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ (অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও সম্পাদনা), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫, পৃ: ৩৩১-৩২।
২২. *মনুসংহিতা* ৩/৬৭-৭১ *মনুসংহিতা,* মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী (সম্পাদনা ও অনুবাদ), কলকাতা, সদেশ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ: ৮৩-৮৪।